# যকের ধন

## হেমেন্দ্রকুমার রায়


**প্রকাশক**
**জিয়াউল হাসান নিয়াজ**

**প্রচ্ছদ**
নন্দন ডিজাইন

প্রকাশনী
**প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স**

**বইমেলা পরিবেশক**
নয়া উদ্যোগ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

## এক

# মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো দামি জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরোনো পকেট–বুক, আর একখানা ময়লা–কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, "কী, কী হোলো মা?" মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "কুমার, শিগ্‌গির ওটা ফেলে দে!"

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপরে পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, "লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা। ঠাকুরদা কি বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?"

মা বললেন, "ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল?"

মড়ার মাথার খুলিটা জানালা গলিয়ে আমি বাড়ির পাশের একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট–বুকখানা ঘরের একটা তাকের উপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে রাখলেন।

দিন–কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর



একটুও বনিবনা ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনও আমাদের বাড়িতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, "কুমার, তোমার মাথার উপরে এখন আর কোনো অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেছি।"

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম, তাঁকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, "যদি কখনও দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।"

করালীবাবু বসে বসে এ কথা সে কথা কইতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললুম, "ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে।"

করালীবাবু বললেন, "কী জিনিস?"

আমি বললুম, "একটা চন্দন–কাঠের বাক্সের ভিতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি–"

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "মড়ার মাথার খুলি?"

"হ্যাঁ, আর একখানা পকেট–বই।"

"সে বাক্সটা এখন কোথায়?"

"লোহার সিন্দুকেই আছে।"

করালীবাবু তখনই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চিৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু-চারবার ধমক দিলুম,

কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠল। সে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল।

তারপরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন দুড়-দুড় করে ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। চারদিকে খোঁজ করলুম, কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারি ভ্রম। বাঘার গলার শিকল খুলে দিয়ে, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম!

সকাল বেলায় ঘুম ভেঙেই শুনি মা ভারি চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছেন। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কী মা?"

মা বললেন, "ওরে, কাল রাত্তিরে বাড়িতে চোর এসেছিল!"

তাহলে কাল রাত্রে যা শুনেছিলুম তা ভুল নয়!

মা বললেন, "দেখবি আয়, বড় ঘরে লোহার সিন্দুক খুলে রেখে গেছে।"

ঘরে গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই! কিন্তু চোর বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি কেবল সেই চন্দন কাঠের বাক্সটা ছাড়া।

কিন্তু মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল! সিন্দুকে এত জিনিস থাকতে চোর খালি বাক্সটা নিয়ে গেল? আরে মনে পড়ল, কাল সকালে এই বাক্সের কথা শুনেই করালী বাবু কীরকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে কি এই বাক্সের মধ্যে কোনো রহস্য আছে? সম্ভব। নইলে, একটা মড়ার মাথার খুলি কে আর এত যত্ন করে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দেয়?

মাকে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে ফুটলুম। বাড়ির পাশের খানাটার মুখে গিয়ে দেখলুম, মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ জঞ্জালের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে! সেটাকে আর একবার পরখ করবার জন্য তুলে নিলুম। খুলির এক পিঠে গাঢ় কালো রং মাখানো ছিল-কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে! আর যেখানেই রং নেই, সেইখানেই আঁকের মতন কী কতকগুলো খোদা রয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খুলিটাকে লুকিয়ে আবার বাড়িতে আনলুম। সাবান-জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই কালো রং উঠে গেল। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম খুলির এক পিঠের সবটায় কে অনেকগুলো অঙ্ক খুদে রয়েছে। অঙ্কগুলো এই রকম :

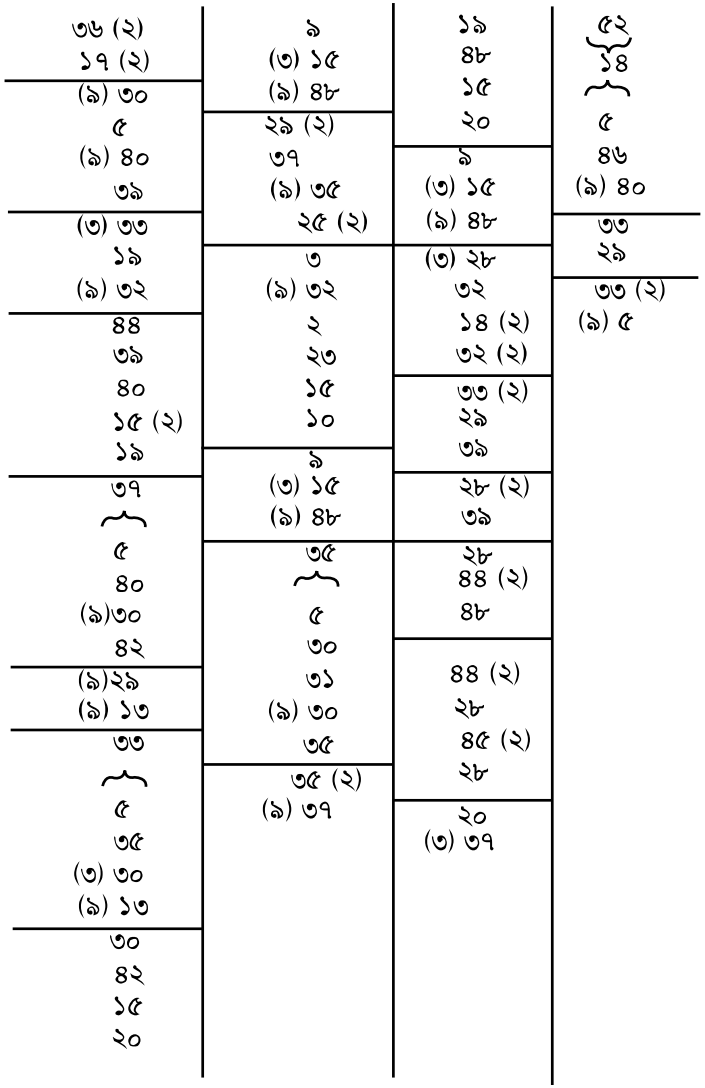






## দুই

# যকের ধন

এই অদ্ভুত অঙ্কগুলোর মানে কী? অনেক ভাবলুম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদাদার পকেট–বইয়ের কথা। সেখানাও তো এই খুলির সঙ্গে ছিল, তার মধ্যে এই রহস্যের কোনো সদুত্তর নেই কি?

তখনি উপরে গিয়ে তাক থেকে পকেট–বইখানা পাড়লুম। খুলে দেখি, তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভরতি। গোড়ার দিকের প্রায় ষোলো–সতেরো পাতা পড়লুম, কিন্তু সে-সব বাজে কথা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম:

"১৩১০ সাল, আশ্বিন মাস। আসাম থেকে ফেরার মুখে একদিন আমরা এক বনের ভিতর দিয়ে আসছি। সন্ধ্যা হয়-হয়—আমরা এক উঁচু পাহাড়ে–জমি থেকে নামছি। হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত বড় বাঘ। সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে যেন কার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্য তাক করছে—আরও একটু তফাতে দেখলুম, একজন সন্ন্যাসী পথের পাশে, গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বাঘটার লক্ষ তাঁর দিকেই!

আমি তখনি চিৎকার করে উঠলুম। আমার সঙ্গের কুলিরাও সে চিৎকারে যোগ দিলো। সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল, বাঘটাও চমকে ফিরে আমাদের দেখে এক লাফে অদৃশ্য হলো।

সন্ন্যাসী জেগে উঠেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিলেন। আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, "বাবা, তোমার জন্যে আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম।"

আমি বললুম, "ঠাকুর, বনের ভিতরে এমনি করে কি ঘুমোতে আছে?"

সন্ন্যাসী বললেন, "বনই যে আমাদের ঘর–বাড়ি বাবা!"

আমি বললুম, "কিন্তু এখনি যে আপনার প্রাণ যেত!"

সন্ন্যাসী বললেন, "কৈ বাবা, গেল না তো। ভগবান ঠিক সময়েই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

শুনলুম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সন্ন্যাসীও সেই দিকে যাবেন। তাই সন্ন্যাসীকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে চললুম।

সন্ন্যাসী দু'দিন আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে

ত্রুটি করলুম না। তিন দিনের দিন বিদায় নেবার আগে তিনি আমাকে বললেন, "দেখো বাবা, তোমার সেবায় আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রাণরক্ষাও করেছ। যাবার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।"

আমি বললুম, "কীসের সন্ধান?"

সন্ন্যাসী বললেন, "যকের ধনের।"

আমি আগ্রহের সাথে বললুম, "যকের ধন! সে কোথায় আছে ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী বললেন, "খাসিয়া পাহাড়ে।"

আমি হতাশভাবে বললুম, "কোনখানে আছে আমি তা জানব কেমন করে?"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি, খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?"

আমি বললুম, "শুনেছি। প্রবাদে আছে যে, এই গুহার ভিতর দিয়ে চীনদেশে যাওয়া যায়, আর অনেকবার আগে এক চীনসম্রাট এই গুহাপথে না-কি সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "হ্যাঁ। এই রূপনাথের গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে, উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে





পাবে। সে মন্দির এখন ভেঙে পড়েছে, কিছুদিন পরে তার কোনো চিহ্নও হয়তো আর পাওয়া যাবে না। এক সময়ে এখানে মস্ত এক মঠ ছিল, তাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেকালের এক রাজা বিদেশি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবার আগে এই মঠে নিজের সমস্ত ধন–রত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হয়। পাছে নিজের ধন–রত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, সেই ভয়ে রাজা সে সমস্ত এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেই ধন–রত্ন এখনও সেখানেই আছে—তারপর সন্ন্যাসী আমাকে বৌদ্ধ মঠে যাবার পথের কথা ভালো করে বলে দিলেন।"

আমি বললাম, "কিন্তু এতদিনে আর কেউ যদি সেই ধন–রত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে?"

সন্ন্যাসী বললেন, "কেউ পায়নি। সে বড় দুর্গম দেশ, সেখানে যে বৌদ্ধ মঠ আছে, তা কেউ জানে না, আর কোনো মানুষও সেখানে যায় না। মঠে গেলেও, সারা জীবন ধরে ধন-রত্ন খুঁজলেও কেউ পাবে না। কিন্তু তোমাকে সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে না। ধনরত্ন ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে, তা জানবার উপায় কেবল আমার কাছে আছে।" এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে একটা মড়ার খুলি বের করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললেম, "ওতে কী হবে ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী বললেন, "যে যক ধনরত্নের পাহারায় আছে, এ তারই মাথার খুলি। এই খুলিতে আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, এ খুলি যার কাছে থাকবে, যক তাকে আর কিছুই বলবে না। খুলিতে এই যে অঙ্কের মতো রেখা রয়েছে, এ হচ্ছে সাংকেতিক ভাষা। এই সংকেত বুঝবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলেই তুমি জানতে পারবে ঠিক কোনখানে ধনরত্ন আছে।" এই বলে সন্ন্যাসী আমাকে সংকেত বুঝবার গুপ্ত উপায় বলে দিলেন। তারপর এক বৎসর ধরে অনেক ভাবলুম। কিন্তু একলাটি সেই দুর্গম দেশে যেতে ভরসা হলো না।